শতাব্দীর মোহনায় সিডনি
ও
একরাতের ক্যানবেরা

প্রদীপ দেব

০৬

নতুন বছরের প্রথম দিনের সূর্যালোক জানালায় আসার সাথে সাথেই ঘুম ভেঙেছে। স্বপনদারা ফিরেছেন একটু আগে। গতকাল সারাদিন, সারারাতের ক্লান্তির পরে এখন তাঁদের দরকার একটা দীর্ঘ নিরুপদ্রব ঘুম। আমি যথাসম্ভব নীরবে সকালের কাজ সেরে ব্যাগ গুছিয়ে বেরোবার জন্য তৈরি। আমাকে যেতে হবে। দাদা বৌদিকে কিছু না বলে বেরোই কিভাবে। আবার এসময়ে ঘুম থেকে তাঁদের জাগাতে ইচ্ছা করছে না একটুও। তাঁদের উদ্দেশ্যে একটা চিরকূট লিখে ঘরের অটোমেটিক লক লাগিয়ে বেরিয়ে গেলাম। মিনিট খানেক পরেই চেপে বসেছি সিডনি গামী ট্রেনে। পঁয়ত্রিশ মিনিট পরে নামলাম সিডনি সেন্ট্রাল স্টেশানে।

নিউইয়ার্স ডে উপলক্ষে শহরের বেশির ভাগ দোকানপাট বন্ধ আজ। স্টেশানেও খুব একটা ভীড় নেই। আমার ক্যানবেরার বাস সোয়া দশটায়। হাতে এখনো ঘন্টা খানেক সময় আছে। এ শহরের রাস্তায় রাস্তায় নিজের মতো করে ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছে আছে। কাল ক্যানবেরা থেকে ফিরে এসে তা করা যাবে।

সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশান বিল্ডিং এর মধ্যেই গ্রেহাউন্ড বাস কাউন্টার। চেক ইন করে বোর্ডিং পাস নেবার পরেও দেখি হাতে আরো কিছু সময় আছে। স্টেশান চত্বরে হাঁটতে লাগলাম। রোদে ঝলমল করছে চারদিক। স্টেশানের যাত্রীদের মধ্যে বেশির ভাগই ট্যুরিস্ট। এই সেন্ট্রাল স্টেশানের ২৬ আর ২৭ নাম্বার প্লাটফরমকে বলা হয় ভূতুড়ে প্লাটফরম। তার কারণ হলো ১৯৭৯ সালে এই প্লাটফরমদুটো তৈরি হবার পর থেকে একবারের জন্যও ব্যবহার করা হয়নি। এদুটো প্লাটফরম থেকে কোন ট্রেন ছাড়ে না বা কোন ট্রেন থামেও না এদুটো প্লাটফরমে।

একজন দুজন করে যাত্রী এসে জমা হতে শুরু করেছে ক্যানবেরা গামী বাসের কাছে। সোয়া দশটার বাস ছাড়লো প্রায় দশ মিনিট দেরীতে। ছুটির দিন। কারো কোন তাড়া নেই। সবার মুখ হাসি হাসি। অস্ট্রেলিয়ার মানুষ গায়ে পড়ে আলাপ জমায় অনেক সময়। ভালোই লাগে

তাদের দিলখোলা ভাব। অষ্টাদশী ক্যারেনের সাথে আলাপ হলো। সে ক্যানবেরার মেয়ে। সিডনিতে এসেছিলো কোন কাজে, এখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। ক্যানবেরার ঠিক কোথায় তার বাড়ি তা তো আর সরাসরি জিজ্ঞেস করা যায় না, আর সে বললেও আমি চিনবো না। উর্মিরা থাকে নারাবুন্ধায়। ক্যারেনের কাছে জানতে চাইলাম নারাবুন্ধা কীভাবে যেতে হয়। সে বললো ক্যানবেরা গিয়ে দেখিয়ে দেবে।

হাইওয়ে ধরে ছুটে চলেছে আমাদের বাস। একটা সিনেমা দেখানো হচ্ছে বাসের টেলিভিশনে। রাস্তার দুপাশে যতদূর চোখ যায় সবুজ আর সবুজ। মাঝে মাঝে ঘন গাছপালা, বেশির ভাগই ইউক্যালিপ্টাস গাছের সারি। অস্ট্রেলিয়ান গরু চরছে। এদিকে সম্ভবত প্রচুর ডেইরি ফার্ম আছে। সিডনি থেকে ক্যানবেরার সড়ক দূরত্ব সাড়ে তিনশ কিলোমিটারের মতো। বিরাট চওড়া হাইওয়ে। ওয়ান ওয়ে হওয়াতে অন্যদিক থেকে আসা গাড়ির সাথে আমাদের দেখা হচ্ছেনা। বাইরের ঝকঝকে নীল আকাশ আর দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর দেখতে দেখতে একসময় ক্লান্তিই চলে আসে। সুন্দরের সরবরাহ বেশি হয়ে গেলে সুন্দরও মনোটোনাস হয়ে পড়ে। ক্যারেনের দিকে চোখ গেলো। সে সিটে পা তুলে গুটিশুটি মেরে ঘুমাচ্ছে। দিনের বেলায় ঘুমানোটা এদেশের সংস্কৃতির সাথে ঠিক মেলেনা। কিন্তু বাসে ট্রেনে তো অনেককেই ঘুমাতে দেখি।

বাসের গতি ক্রমশ কমে আসছে। অনেকরকম বিলডিং আর সাইনবোর্ড চোখে পড়ছে। মনে হচ্ছে ক্যানবেরা পৌঁছে গেছি। ক্যারেন চোখ খুলে বাইরে তাকিয়ে বললো, আমরা এসে গেছি। সোয়া দুটোয় গাড়ি থামলো ক্যানবেরা সেন্ট্রাল স্টেশানে। এদেশের সব সিটিতেই একটা করে সেন্ট্রাল স্টেশান থাকে মনে হয়। বেশ সুন্দর লাগলো ক্যানবেরা সেন্ট্রাল। এখানে শুধু বাস থামে। ক্যানবেরায় ট্রেন আসে কিনা আমি জানিনা। ক্যারেনকে জিজ্ঞাসা করলাম। সেও জানেনা। ট্যুরিস্টদের জন্য ইনফরমেশান সেন্টার আজ বন্ধ। তবে বিভিন্ন হোটেলের টেলিফোন নাম্বার আর ছবি সহ বিরাট বিলবোর্ড দেখা যাচ্ছে। বিলবোর্ডে লাগানো নাম্বারে ডায়াল করলে বিনামূল্যে হোটেলের রিসেপশানে কথা বলা যায়। বুকিং করার পরে হোটেলের লোক এসে নিয়ে যাবে এখান থেকে। ব্যবস্থাটা খুব ভালো লাগলো। আমি আপাতত হোটেলে যাচ্ছিনা। আগে উর্মিদের ওখান থেকে ঘুরে আসি। রায়হানকে ফোন করলাম। তারা বসে আছে আমার জন্য। এখন হোটেলে গেলে দেরী হয়ে যাবে। ক্যারেন অপেক্ষা করছে আমার জন্য। আমাকে সিটি বাসে তুলে দেবে। ক্যানবেরার সবাই এরকম পরোপকারী কিনা জানিনা।

ক্যারেন একটা ম্যাপ নিয়ে এলো কোত্থেকে। বাসের রুট আর সময় দেয়া আছে সেখানে। মার্কেট টার্কেট সব বন্ধ আজ। ক্যারেন আমাকে নিয়ে কয়েকটি রাস্তায় হাঁটলো, যদি কোন দোকান পাট খোলা থাকে। আমি উর্মির জন্য কিছু কিনতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু একটা দোকানও খোলা পেলাম না। ক্যারেন খুঁজছে সিগারেট। আমি সিগারেট খাইনা জেনে একটু লজ্জিত হওয়ার ভঙ্গিতে হাসলো। কিন্তু তার নাকি সিগারেটের তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে। দোকান খোলা না পাওয়াতে এবার সে একজন পথচারীকে থামিয়ে একটা সিগারেট চেয়ে নিলো। ভিক্ষা চাইতে লজ্জা লাগলেও সিগারেট চাইতে সম্ভবত লজ্জা লাগেনা। নেশার কাছে মানুষের

অনেক বোধেরই মৃত্যু ঘটে।

আমাকে ধরতে হবে ৩৫ নাম্বার বাস। নারাবুন্ধায় যায় এই বাস। উর্মি আর রায়হান থাকে সেখানে। ক্যারেন যাবে ঠিক উলটো দিকে। তার বাস আমার বাসের আগে। সে বারবার জিজ্ঞাসা করছে আমি যেতে পারবো কিনা। ভালো লাগলো তার আন্তরিকতায়। তার সাথে আমার হয়তো আর কখনোই দেখা হবেনা। কিন্তু হু কেয়ার্‌স ফর দ্যাট? মানুষকে সাহায্য করার ব্যাপারটা হয়তো ক্যারেনদের সহজাত একটা গুণ। তার সাবলীলতায় আমি মুগ্ধ। হাত নাড়তে নাড়তে চলে গেলো সে। আমি ৩৫ নাম্বার বাসে চড়ে বসলাম। বাসে আমি সহ মাত্র চারজন যাত্রী। সবাই বৃদ্ধ। ড্রাইভারও বেশ বয়স্ক। ক্যানবেরাতে বৃদ্ধদের সংখ্যা বেশি বলে শুনেছি। তরুণরা এরকম একটা ছোট চুপচাপ এলাকায় থাকতে চায়না হয়তো। অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী এই ক্যানবেরা। কিন্তু রাজধানী বললে যেরকম একটা ব্যস্ত বাণিজ্যিক শহরের কথা মনে হয়, এটা সেরকম নয়। শুধুমাত্র প্রশাসনিক কাজের জন্য প্ল্যান করে এশহর গড়ে তোলা হয়েছে। ক্যানবেরাই নাকি পৃথিবীর একমাত্র সিটি যেটা আগে পরিকল্পনা করা হয়েছে, তারপর নগরায়ন হয়েছে। সাধারণত হয়ে থাকে উলটো। কোনভাবে বসতি গড়ে ওঠে কোথাও, তারপর পরিকল্পনা করা হয় কীভাবে তার উন্নয়ন করা যায়।

বাসের জানালা দিয়ে তাকাচ্ছি আমি। কোথাও কোন জনমানুষ চোখে পড়ছেনা। মনে হচ্ছে রূপকথার কোন ঘুমন্ত শহরে এসে পৌঁছেছি। বিরাট বিরাট রাস্তা। সব গাছপালার ছায়ায় ঢাকা। চারদিকে সবুজ আর সবুজ। 'গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বনের বাস'। বাসের ভেতরে যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে দেখি চারজনই তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। চোখে চোখ পড়তেই একজন বললেন, 'হ্যাপি নিউইয়ার মাইট'। আজ নিউইয়ার্স ডে এটা এখানে কীভাবে সেলিব্রেট করেছে আমি জানিনা। আমি কোথায় যাবো, সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন এরা। বাসের টিকেট করার সময় কোথায় যাবো একবার বলেছি। তখন হয়তো খেয়াল করেননি কেউ। কারণ এখানে সিটি বাসের ভাড়া যেখানেই যাও, সমান। দুইডলার প্রতি ট্রিপ। বাসের ড্রাইভার আর যাত্রীরা যেন প্রতিযোগিতা করে সাহায্য করলেন আমাকে। ৪৭নাম্বার বাড়ির সামনে কোন স্টপেজ নেই। কিন্তু ড্রাইভার সেখানেই গাড়ি থামিয়ে আমাকে নামিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, আমি যে ঠিক জায়গায় নেমেছি তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। আমাকে দেখে রায়হান ছুটে আসার পরে বাসড্রাইভার হাত নেড়ে চলে গেলেন তাঁর গন্তব্যে। ভালো লাগলো খুব। মনে হলো নিয়ম যে মানুষের জন্যই তৈরি তা এরা খুব ভালো জানেন। আসলে নিয়মের চেয়ে মানুষের সংখ্যা কম হলে এরকম বদান্যতা দেখানো সবদেশেই সম্ভব।

রায়হানকে আমি আগে কখনো দেখিনি। উর্মির যখন বিয়ে হয়, তখন আমি দেশের বাইরে। রায়হান আমাকে দেখে দৌড়ে রাস্তায় চলে এসেছে। লুঙ্গি আর টিশার্ট পরা মোটা পাওয়ারের চশমা চোখে রায়হানকে প্রথম দেখাতেই ভালো লেগে গেলো আমার। কতদিন পরে উর্মিকে দেখলাম। উর্মি আমার দিদির ননদের মেয়ে। খুব শুকিয়ে গেছে মেয়েটা।

ছোট্ট ছিমছাম বাসা। ঢুকতেই রান্নাঘর, তারপর বসার ঘর আর শোয়ার ঘর। সবকিছু চমৎকার

ভাবে গোছানো। রান্না হিটিং সবকিছু ইলেক্ট্রিক এখানে। গ্যাস থাকলে ভালো হতো। এদেশে ইলেক্ট্রিসিটির দাম গ্যাসের চেয়ে বেশি। ক্যানবেরার বড় সমস্যা হলো এখানে বাসা ভাড়া পাওয়া যায় না সহজে। কারণ ভাড়া দেওয়ার জন্য বাড়ি এখানে খুব একটা বানায় না কেউ। বৃদ্ধ আর চাকুরীজীবীরাই মূল বাসিন্দা ক্যানবেরার। এখন অবশ্য ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিছু ঘর তৈরি হচ্ছে। রায়হানের বাড়িওয়ালা নিজের থাকার ঘর থেকে একটা অংশ ভাড়া দিয়েছে এদের। এর চেয়ে বড় বাসা লাগেনা আসলে এখানে। দুজনের সংসার। রায়হান কাজ করে উলওয়ার্থে। উর্মি ভর্তি হয়েছে ক্যানবেরা ইউনিভার্সিটিতে। সুখে আছে তারা, দেখে খুব ভালো লাগলো আমার।

পোলাও, মাংস, মাছ ইত্যাদি হরেক রকম আয়োজন করে রেখেছে তারা। খেতে খেতে গল্প আর গল্প করতে করতে খাওয়া হলো। দেশের গল্প। দেশের মানুষের গল্প। এখানকার বাঙালিদের গল্প, রায়হানের বন্ধুদের গল্প, ক্যানবেরার চাকুরির বাজার আর বাংলাদেশের রাজনীতি সবকিছু নিয়ে প্রাণ খুলে আড্ডা মারলাম অনেকক্ষণ। রায়হানের সাথে গল্প করে বেশ মজা পাওয়া যায়। ছেলেটা মামাশ্বশুর বলে আমার সাথে কোন সংকোচজনক দূরত্ব রাখছেনা এজন্যই তাকে এত ভালো লাগছে আমার।

সন্ধ্যার দিকে বেরুলাম একটু। ঘুরে বেড়ানোর জন্য। রায়হান সাথে আসতে চাইলো। কিন্তু উর্মিকে বাসায় একা রেখে বেরুতে মানা করলাম। এমনিতেই তো তাকে অনেক সময় একা কাটাতে হয়। আজ ছুটির দিনেও সেটা করা উচিত হবেনা। তাছাড়া একটু একা ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছা করলো আমার। নতুন জায়গা দেখার জন্য একা ঘুরে বেড়ানো খুব ভালো বলে মনে হয় আমার।

ক্যানবেরার রাস্তাগুলো বিশাল। সে তুলনায় ফুটপাত খুব ছোট। রাস্তা আর ফুটপাতের মাঝে বেশ চওড়া, রাস্তার চেয়েও প্রশস্ত জায়গা। সেখানে গাছ আর ঘাসে ভর্তি। স্ট্রিট লাইট খুব কম। যে কয়টা লাইট আছে সেখান থেকে আলো যা আসে তাও খুব টিমটিমে। এখানে বোধ হয় সন্ধ্যার পরে কেউ হাঁটতে বেরোয় না। আমি ছাড়া আর কোন ব্যক্তির দেখা পেলাম না রাস্তায়। হেঁটে হেঁটে ক্লে ক্রিসেন্ট থেকে মানুকা সেন্টার পর্যন্ত আসার পথে আর একটা মানুষও দেখলাম না। ছুটির দিন বলেই হয়তো। মানুকা সেন্টারে বেশ কিছু দোকানপাট, ব্যাংক আর সুপারমার্কেট আছে। এখান থেকে একটা ট্যাক্সি নিলাম। ট্যাক্সিওয়ালা ভিয়েতনামী। এগারো বছর ধরে নাকি আছে এই ক্যানবেরায়। কথা শুনে মনে হলো সে ক্যানবেরার প্রেমে পড়ে গেছে। ক্যানবেরার সব কিছুই ভালো তার কাছে। এখানে ট্যাক্সির সংখ্যা খুব বেশি না হওয়াতে খুব একটা প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হচ্ছে না তাকে। সে আমাকে নিয়ে চললো ম্যাক্‌কোয়ারি হোটেলে।

বেশ বড় হোটেল এই ম্যাক্‌কোয়ারি। রুম পেতে কোন অসুবিধা হলো না। চাবি নিয়ে একই ট্যাক্সিতে ফিরে এলাম মনুকা সেন্টারে। আমি ট্যাক্সি ছাড়তে চাইলেও সে আমাকে ছাড়তে চাচ্ছেনা। সে বলছে ফেরার পথে আমি রাস্তা ভুল করতে পারি। সে তখন দেখা যাবে। একটু আগেই আমি হেঁটে এসেছি এই পথে। ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। অস্ট্রেলিয়ায় টিপ্‌স দেয়ার প্রথা

চালু নেই। কিন্তু আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে বেশ ভালোই টিপ্‌স দিলাম। উল্‌ওয়ার্থে ঢুকলাম। এই চেইন সুপারমার্কেটের নাম সবজায়গায় উল্‌ওয়ার্থ, কিন্তু মেলবোর্নে এর নাম সেফওয়ে। আমি জানিনা কেন। উল্‌ওয়ার্থ সাহেবের এই ব্যবসা পৃথিবীবিখ্যাত। ভেতরে ঢুকে এবার স্বাভাবিক ভাবেই তুলনা এসে যাচ্ছে মেলবোর্নের সাথে। দেখলাম মেলবোর্নের তুলনায় এখানে জিনিস পত্রের দাম অনেক বেশি। একই কোম্পানির জিনিস, একেক জায়গায় একেক দাম। দ্রব্যমূল্য কীভাবে নির্ধারিত হয় আমি জানিনা।

সুপারমার্কেট থেকে বেরিয়ে দেখলাম রাস্তার রাউন্ড এবাউট থেকে দুই তিনটি রাস্তা চলে গেছে ভিন্ন ভিন্ন দিকে। এর কোনটা ধরে এসেছিলাম আমার আর মনে নেই। ট্যাক্সিওয়ালার কথা মনে হলো। রাস্তা ভুল করতে পারি! পকেটে ম্যাপ আছে। খুলে বের করে দেখলাম আর খুব নিশ্চিত হয়ে পথ ঠিক করলাম। এবার মিনিট দশেক হাঁটলেই পৌঁছে যাবো উর্মিদের বাসায়। কিন্তু না, পথ শেষ হচ্ছেনা। আমি কি বাড়ির নাম্বার ভুল করছি? সবগুলো বাড়িই একই রকম দেখতে। আসার সময় দিনের আলোর কিছুটা অবশিষ্ট ছিলো। এখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। দিনের আলোয় যেটুকু বৈষম্য দেখা যেতো বিভিন্ন বাড়ির মধ্যে এখন তা আর চোখে পড়ছেনা। কোন্ রাস্তায় আছি তা বোঝার কোন উপায় নেই। রাস্তায় কোন লাইট নেই। লোক নেই। বাস বন্ধ হয়ে গেছে ছটার সময়। পকেটের ম্যাপ তো নিজে নিজে কথা কইবে না। ম্যাপ খুলে যে দেখবো, আলো নেই কোথাও। মানুষের বাসার সামনে লাগানো বাতির আলোয় গিয়ে ম্যাপ দেখেও কিছু বোঝার উপায় নেই। রাস্তায় নির্দেশক সাইনগুলো এত দূরে যে তা পড়া যায় না কোন্‌টা কোন্ স্ট্রিট। শহরটার পরিকল্পনাকারীদের কেউই আমার মতো ট্যুরিস্টের কথা ভাবেননি তাতে আমি নিঃসন্দেহ হলাম। মনে হচ্ছে আমি এক ভূতুড়ে শহরের গোলক ধাঁধায় পড়ে গেছি। প্রায় দুঘন্টা অনবরত হাঁটার পরে মনে হলো যথেষ্ট হয়েছে। এবার ট্যাক্সি ডাকা দরকার। ডাকবো যে টেলিফোন বুথ কোথায়? আশে পাশে থাকার কথা। প্রতি রাস্তাতেই থাকার কথা। কিন্তু সব কথা সম্ভবত ক্যানবেরার জন্য খাটেনা। চোখেই পড়ছেনা টেলিফোন বুথ। আরো কিছুক্ষণ হাঁটার পর মেইন স্ট্রিটে এসে একটা মার্কেট টাইপের চোখে পড়লো। বন্ধ। একটা টেলেস্ট্রা ফোনবুথ চোখে পড়লো। ট্যাক্সিকে ফোন করলাম। একটা কলের জন্য চল্লিশ সেন্ট লাগার কথা। আমি দুই ডলারের কয়েন দিয়েছি টেলিফোনের কয়েন স্লটে। এক ডলার ষাট সেন্ট ফেরত দেয়ার কথা। কিন্তু কয়েন রিটার্ন স্লটে কোন শব্দ নেই। বার কয়েক ঝাঁকুনি খেয়েও নির্বিকার টেলিফোন বক্স। কোন কোন মেশিন পয়সা ফেরত দেয় না, সেটা কিন্তু লেখা থাকে। এখানে সেরকম কিছু লেখাও নেই। ব্যথা লাগা আঙুলেই ব্যথা লাগে বার বার। সেরকমই হচ্ছে এখানে। অবশেষ ট্যাক্সি এলো। উর্মিদের বাসায় আসতে ট্যাক্সিতেই লাগলো পুরো বিশ মিনিট। আমি যে শহরের কোন প্রান্তে চলে গিয়েছিলাম হাঁটতে হাঁটতে। রায়হান চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করছিলো আমি এতক্ষণ কোথায় ছিলাম! তাকে তো আর বলা যায় না আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম!

রাতের খাবার খেলাম বারোটার দিকে। উর্মিদের দৈনন্দিন রুটিন এখন অনেকটা এরকম। রায়হানের রাতের শিফ্‌টে কাজ থাকে বারোটা থেকে তিনটা। সে ফিরে এলে তাদের রাত হয়। সে হিসেবে সকাল হয় দশটা এগারোটার দিকে। এদেশে ভালো ভাবে থাকার জন্য খুব কষ্ট করতে হয়। আগে অভ্যাস কারো থাকে না এরকম কষ্ট করার। কিন্তু আস্তে আস্তে

সিস্টেমের সাথে এডজাস্ট হয়ে যায়। আমি হোটেলে চলে যাবো শুনেই মন খারাপ করে ফেললো উর্মি আর রায়হান। বিদেশে এতদিন থাকার পরেও এরা একটুও প্রাক্‌টিক্যাল হয়নি এখনো। আমি কাল দুপুরে চলে যাবো। আজ তাদের দেখে গেলাম। কাল সকালে ক্যানবেরায় ঘুরবো নিজের মতো করে। কিন্তু তারা কিছুই বুঝতে চাচ্ছেনা। উর্মিটা বরাবরই খুব চাপা। নিজের কষ্টের কথা সে কাউকেই বলেনা। এখন তার মুখ দেখে আমি বুঝতে পারছি আমি তাদের বাসায় রাতে থাকছিনা এটা সে মেনে নিতে পারছেনা। তার মামা তার শহরে এসে হোটেলে থাকবে এটা তাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। তাকে বলি আমার নিজের অসুবিধার কথা। আবার একসময় এসে বেড়িয়ে যাবার কথা। রায়হান ফোন করে ট্যাক্সি ডেকে দেয়। আমারো খুব কষ্ট হয় তাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে। কষ্ট তাড়াতে আলাপ জমাই ট্যাক্সিওয়ালার সাথে। দশ মিনিটেই আমাকে হোটেলে পৌঁছে দেয় লেবানিজ ট্যাক্সিওয়ালা।

হোটেলের বাম দিকের ''এ'' ব্লকে আমার ঘর। গেটের চাবি আর রুমের চাবি আলাদা। আমার রুম একদম ভেতরের দিকে। রুমে ঢুকে বিছানায় ছুড়ে দিলাম নিজেকে। মনে হচ্ছিলো শোয়ার সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়বো। কিন্তু হলো উল্‌টো। বিছানার আরামে শুলাম ঠিকই, কিন্তু ঘুম পালালো। দিনের বেলায় বেশ গরম লাগলেও এখন বেশ ঠান্ডা। মনে হচ্ছে প্রচন্ড শীত পড়ছে। ক্যানবেরায় শীতকালে তাপমাত্রা মাইনাসে চলে যায়। এখন প্রচন্ড গ্রীষ্মকালেও দেখি শীতকালের ঠান্ডা। পাশের রুম থেকে অদ্ভুত শব্দ ভেসে আসছে। হাসির শব্দের সাথে সাথে প্রচন্ড দাপাদাপি। হয়তো নিউইয়ার্স সেলিব্রেশান চলছে নিজেদের মধ্যে। আমার মন ঘুরে ফিরে চলে যাচ্ছে আবারো বাংলাদেশে। মনের ওপর জোর খাটানো যায়। কিন্তু কতক্ষণ?